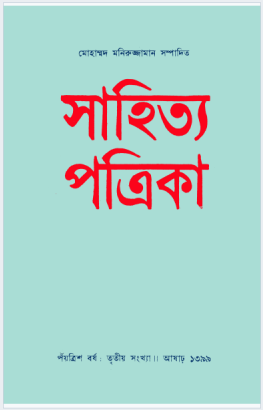

Vol. 35 | No. 3 | 1992

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

মনোমোহন ঘোষ

Volume	35
Issue	3
Year	1992
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	নূরুর রহমান খান
Published online	June 1, 1992
DOI	10.62328/sp.v35i3.3
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v35i3.3
Pages	43-59
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

মনোমোহন ঘোষ

নূরুর রহমান খান

০১. স্মৃতিতর্পণে এক ধরনের নস্টালজিয়া মনের অগোচরে কখনো কখনো সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং ফলে ক্ষেত্রবিশেষে কাজটি নির্মোহ ভাবে সুসম্পন্ন হওয়ার পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। তবু বলা যায় পরিণত স্তরে অতীতচারণায় মনের অকপট সত্য আবেগমিশ্রিত হলেও বেরিয়ে আসে এবং আন্তরিক সারল্যে তা মর্মকে স্পর্শ করে।

জন্মলগ্ন থেকেই বহু বৈরী মন্তব্য ও শ্লেষোক্তিকে ভূষণ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শুভযাত্রা। যাঁরা এই নবজাত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটিকে 'মেক্কা অব দি ঈস্ট্' বলে হেয় প্রতিপন্ন করার হীন মনোবৃত্তিকে প্রশ্রয় দিয়ে উল্লসিত হয়ে উঠেছিলেন তাঁদের বিস্ময়ের অন্ত রইলো না যখন দেখলেন বিভিন্ন বিভাগে খ্যাতিমান শিক্ষকবৃন্দ একের পর এক যোগদান করছেন। অন্যতম কারণ, 'তখনকার দিনে এত উচ্চ বেতন কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা পেতেন না।'[১] বিশ্ববিদ্যালয় জ্ঞানচর্চার তীর্থপীঠ। আর গুণীজনের সান্নিধ্যকামনায় জ্ঞান-পিপাসু-হৃদয়মাত্রই উদ্বেলিত হয়ে ওঠে। তাই প্রচলিত প্রথারও ব্যত্যয় ঘটতে লাগলো। উচ্চ শিক্ষার্থে রাজধানী অভিমুখেই ধাবমান হওয়ার কথা। কিন্তু দেখা গেল কলকাতা শহরে থেকে স্নাতক ডিগ্রি নিয়ে অনেকে ঢাকায় আসছেন এম. এ. পড়ার উদ্দেশ্যে। 'কেন ঢাকায় গেলাম?'— এই কৈফিয়ৎ দিতে গিয়ে শ্রীসরল গুহ লিখছেন—'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তখন প্রতিভার বন্যা বয়ে যাচ্ছে। শিক্ষায় হাল ধ'রে আছেন সত্যেন্দ্রনাথ বসু, জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, রমেশচন্দ্র মজুমদার, হীরেন্দ্রলাল দে, হরিদাস ভট্টাচার্য, সুশীলকুমার দে, চারু বন্দ্যোপাধ্যায়, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, মোহিতলাল মজুমদার, সত্যেন্দ্রনাথ রায় এবং আরও অনেক প্রতিভাধর অধ্যাপক। পড়াশুনা হোক বা না হোক অন্ততঃ এই সকল আচার্যদের দেখতে পাবো, এঁদের কথা শুনতে পাবো এই লোভটাই আমার কাছে বড়ো হয়ে উঠেছিল।'[২] সোনালি অতীতে ডুব দিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষক ও শিক্ষার্থী শ্রীঅমলেন্দু

বসুও আত্যন্তিক শ্লাঘায় স্মরণ করেছেন যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে জ্ঞান-সাধনার সহযোগী ছিলো ব্যক্তিত্ব বিকাশের অমূল্য সুযোগ— পরবর্তীকালে যা বহু জীবনে নানাভাবে বিকশিত হয়েছে। প্রথিতযশা শিক্ষাবিদদের প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন— 'ইতিহাসের এ. এফ. রহমান সাহেব, ইংরেজী বিভাগের মাহমুদ হাসান সাহেব; বাংলা-সংস্কৃত বিভাগের মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ সাহেব এঁরা প্রত্যেকেই নিজ নিজ অনস্বীকার্য মেধার বলে শিক্ষণ কার্যের ও জ্ঞানজগতের উচ্চ পর্যায় অধিকার করেছিলেন, মুসলমানত্বের বলে নয়। শহীদুল্লাহ্ সাহেব ভাইস-চ্যান্সেলর হননি, পাকিস্তানকালেও হননি, কিন্তু কে না মানবে যে তিনি এই শতকের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী মহাপণ্ডিতদের অন্যতম ছিলেন?'[৩] যাঁরা সাম্প্রদায়িক বিষবাষ্পে আচ্ছন্ন থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাকে স্বাগত জানাতে কুণ্ঠা বোধ করেছেন তাঁদের কূপমণ্ডুকতাকে সুচিহ্নিত করে অমলেন্দু বসু বাস্তব সত্যকে নির্দ্বিধায় তুলে ধরেছেন— 'প্রথমে ছাত্র ও পরে শিক্ষক হিসাবে বাইশ বৎসর আমার জীবন অতীব অন্তরঙ্গভাবে জড়িয়ে গিয়েছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে, এই দীর্ঘকালের মধ্যে আমি দেখিনি যে ধর্মের কারণে কোনো ছাত্রকে পরীক্ষার, ক্রীড়াপ্রাঙ্গণের, ভাষণ-কৃতিত্বের প্রতিযোগিতায় উচ্চ সম্মান দেওয়া হয়েছে। কৃতিত্বের প্রতিযোগিতায় হিন্দু ছিল না, মুসলিম ছিল না, ছিল কৃতী তরুণ।'[৪] শিক্ষক নির্বাচন ও নিয়োগেও এই নীতি অত্যন্ত সততার সঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুসৃত হতো। ফলে প্রথমাবস্থায়ই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বিদ্বজ্জন সমাবেশে রত্নাকরবিশেষ হয়ে ওঠে। এর সুফল প্রতিটি বিভাগেই ছিলো সুস্পষ্ট। বিশেষ করে তৎকালীন বাংলা বিভাগকে ঋদ্ধতম বিভাগ বললেও অত্যুক্তি হবে না। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী থেকে শুরু করে ড. সুশীলকুমার দে, মোহিতলাল মজুমদার, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য, মুহম্মদ আবদুল হাই, শহীদ মুনীর চৌধুরী, শহীদ মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী— প্রত্যেকেই ছিলেন ব্যক্তিক ঔজ্জ্বল্যে দীপ্যমান, আপন কৃতি-কৃতিত্বের মৌলিকতায় ভাস্বর। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপনার দুর্লভ সৌভাগ্যলাভ যে কী দুরূহ ছিলো এবং প্রতিভা কতোটা উচ্চস্তরের ও জ্ঞানের পরিধি কি পরিমাণ বিস্তৃতি লাভ করলে তা' সম্ভব হতো তার কিছুটা মূল্যয়ন সম্ভব প্রাক্তন অধ্যাপকদের জীবন পর্যালোচনার মাধ্যমে। অধ্যাপক (ড.) মনোমোহন ঘোষ সম্পর্কে যৎসামান্য আলোকপাতের উদ্দেশ্যেই এই দীর্ঘ গৌরচন্দ্রিকার অবতারণা— যদিও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে তিনি মাত্র আড়াই বৎসরকাল অধ্যাপনায় নিয়োজিত ছিলেন।

০২. *সংসদ বাঙালী চরিতাভিধান,* সংযোজন খণ্ডে ড. মনোমোহন ঘোষের জন্ম ও মৃত্যুসন হিসেবে যথাক্রমে উল্লিখিত ১৮৯৫ এবং আগস্ট, ১৯৭৯। তাঁর জন্ম সন নিয়ে যথেষ্ট সংশয়ের কারণ রয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংরক্ষিত তাঁর ব্যক্তিগত নথিপত্রে দেখা যাচ্ছে ড. ঘোষ ১৭ই মার্চ, ১৯৪৪-এ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে 'রীডার' পদের জন্যে আবেদন করেছিলেন এবং তাঁর বয়সের ঘরে লেখা রয়েছে 'Forty four years and two months'। এই তথ্যানুযায়ী তাঁর জন্ম সন হওয়ার কথা জানুয়ারী, ১৯০০। কিন্তু তাঁর চাকুরির নবায়ন প্রসঙ্গে ড. ঘোষ ২০শে ডিসেম্বর, ১৯৪৬-এ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য মহোদয়কে লেখা অনুযোগপত্রে লিখেছেন, 'The authorities of this University have not taken timely steps for the renewal of my service till the end of the session in which I shall attain the 55th year, according to the letter of appointment no. 334, dated the 12th July 1944.' বয়স সংক্রান্ত অনুরূপ তথ্য ১৯৪৬-এর ২৯শে জুলাই তারিখে উপাচার্য মহোদয়কে লেখা অপর একটি পত্রেও পাওয়া যাচ্ছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'Session' জুলাই থেকে জুন পর্যন্ত। সুতরাং ১৯৪৭-এ ড. মনোমোহন ঘোষের বয়স ৫৫ বৎসর হওয়ার কথা। তাহলে তাঁর জন্ম সন হওয়া উচিত ১৮৯২। এ বিষয়ে অতিরিক্ত জটিলতার অবতারণা না করে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে ড. মনোমোহন ঘোষ জন্ম গ্রহণ করেন।

০৩. মনোমোহন ঘোষের বাল্য-কৈশোর সম্বন্ধে যথেষ্ট তথ্য আমাদের হাতে নেই। *সংসদ বাঙালী চরিতাভিধান* সূত্রে জানা যায় যে, 'স্কুলের ছাত্রাবস্থাতেই [মনোমোহন] বিপ্লবী পুলিন দাসের সংস্পর্শে আসেন। আই. এ. পড়ার সময় অনুশীলন দলের সঙ্গে যুক্ত হন। বছর খানেক কারারুদ্ধ থাকেন। মুক্তি পাবার পরও তাঁকে মোক্তারী পরীক্ষায় বসতে বা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ভর্তি হতে দেওয়া হয় না। এ সময় তিনি সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনুপ্রেরণায় শিলাইদহে রবীন্দ্রনাথ প্রবর্তিত গ্রামীণ পুনর্গঠনের কাজে নিযুক্ত হন। ১৯২২ খ্রী. সুরুলের দোকান ও গুদাম-রক্ষক হিসাবে শান্তিনিকেতনে আসেন। এই কাজের সঙ্গে পড়াশুনাও চালিয়ে যান। ১৯২৬ খ্রী. শান্তিনিকেতন স্কুলের শিক্ষক হন।'[৫] ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাপ্ত নথিপত্রে দেখা যাচ্ছে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার দীর্ঘ এক যুগ পরে মনোমোহন ঘোষ আই. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। অবশ্য এ সময় তাঁর বিদ্যাচর্চায় বিন্দুমাত্র ভাটা পড়েনি। বরঞ্চ বলা যায়, এ সময়কালে তিনি যথার্থ অর্থেই

সরস্বতীর সাধনায় নিমগ্ন থেকে ভবিষ্যতের জন্যে নিজেকে প্রস্তুত করেছেন। প্রাচ্য কাব্যসাহিত্য, দর্শন ও ভাষাতত্ত্বে গভীর পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। বিভিন্ন পরীক্ষার ফলাফল থেকে তাঁর অসাধারণ মেধার পরিচয় মেলে। পরবর্তীকালে ভাষাবিদ হিসেবেও তিনি সুধীজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংরক্ষিত ড. মনোমোহন ঘোষের ব্যক্তিগত নথিপত্র থেকে তাঁর শিক্ষা ও কর্মজীবন সম্পর্কে নিম্নোক্ত তথ্যবলী পাওয়া যাচ্ছে।

ক. শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ

সন	পরীক্ষা	বিশ্ববিদ্যালয়/ ডিগ্রী প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান	বিভাগ/ শ্রেণী	বিশেষ কৃতিত্ব
১৯১৫	প্রবেশিকা	কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়	১ম	চট্টগ্রাম বিভাগে ২য় স্থান লাভ করে মাসিক ১৫টাকা বৃত্তি লাভ
১৯২০	কাব্যে'আদ্য' ও'মধ্য' পরীক্ষা	কলকাতা সংস্কৃত অ্যাসোসিয়েশন	১ম	
১৯২৩	কাব্যতীথ	ঐ	–	
১৯২৪	সাংখ্যদর্শনে'আদ্য'			
	ও'মধ্য' পরীক্ষা	ঐ	১ম	
১৯২৭	আই. এ.	কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়	১ম	
১৯২৯	বি. এ. সম্মান, (ভাষাতত্ত্ব)	ঐ	–	
১৯৩১	এম. এ. (তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব)	ঐ	১ম	১ম শ্রেনীতে ১ম স্থান অধিকার করে বিশ্ববিদ্যালয় স্বর্নপদকলাভ।
১৯৩৩	এম. এ. (বাংলা) *	ঐ	১ম	১ম শ্রেণীতে ২য় স্থান অধিকার করে বিশ্ববিদ্যালয় রৌপ্যপদকলাভ।
১৯৩৮	পি-এইচ'ডি. (ভাষাতত্ত্ব)	ঐ		অভিসন্দর্ভের বিষয় 'পানিনীয় শিক্ষা ও কর্পূরমঞ্জরী।'

* নন্ কলেজিয়েট ছাত্র হিসেবে 'বাংলা'য় এম. এ. পরীক্ষা দেন। এ-সময় সহকারী ভাষা হিসেবে তাঁর বিষয় ছিলো 'হিন্দি'।

মনোমোহন ঘোষ ১৯৩২ থেকে '৩৫ পর্যন্ত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাতত্ত্ব ও ধ্বনিতত্ত্ব বিভাগে গবেষণা সহকারী ও গবেষক হিসবে ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের তত্ত্বাবধানে গবেষণাকর্মে নিয়োজিত ছিলেন।

সংস্কৃত, প্রাকৃত এবং তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব ড. ঘোষের বিচরণক্ষেত্র হলেও ভারতীয় নাট্যতত্ত্ব ও প্রাকৃত সাহিত্যে বিশেষজ্ঞ হিসেবে পণ্ডিতসমাজে বিশেষভাবে স্বীকৃতি লাভ করেছিলেন।

খ. শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা :

১৯২৭—'২৯ বিশ্বভারতীর স্কুল ও কলেজ বিভাগে সংস্কৃত ও বাংলা পড়াতেন। অবশ্য শান্তিনিকেতনের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ১৯২৩ থেকে এবং ১৯২৩ থেকে '২৯— এই সময়কালে মনোমোহন ঘোষ কখনো ছাত্র, কখনো সহকারী গ্রন্থাগারিক আবার কখনো শিক্ষক হিসেবে বিশ্বভারতীর সঙ্গে সম্পর্কিত ছিলেন।

১৯৩৩—'৩৫ : কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক শ্রেণীতে ভাষাতত্ত্ব বিভাগে অধ্যাপনা করেন। ১৯৩৫-এ উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত বিভাগে লেকচারার হিসেবে যোগদান করেন এবং স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে পাঠদান করতে থাকেন।

১৯৪১—'৪৪ : ১৯৪১ থেকে বিশেষ অনুরোধে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক ভাষা বিভাগের অধীন বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে অধ্যাপনা করেন। ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য ও ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'সুবর্ণলেখা'য় (১৯৭৪) উল্লিখিত ১৯৪২-'৪৩-এ ড. মনোমোহন ঘোষ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সহকারী লেকচারার হিসবে কর্মরত ছিলেন। (পৃ. ৪৪) ড. ঘোষকে দেয়া অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের ১৪ মার্চ, ১৯৪৪ তারিখের প্রশংসা-পত্র থেকে জানা যাচ্ছে যে ড. ঘোষ সে-সময়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগে লেকচারার হিসেবে অধ্যাপনা করছিলেন।

১.৮.১৯৪৪—১৫.১.১৯৪৭ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগের 'রীডার' ও বিভাগীয় প্রধান।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে নিযুক্তির উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপিত 'রীডার' ও বিভাগীয় প্রধান পদ লাভের জন্য ১৭ই মার্চ, ১৯৪৪-এ তিনি আবেদন করেন। চারজন আবেদনকারীর মধ্যে ড. শশিভূষণ দাসগুপ্ত , ড. মনোমোহন ঘোষ এবং ড. মুহম্মদ এনামুল হক ১৯৪৪-এর ১লা জুলাই তারিখে অনুষ্ঠিত সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠানে উপস্থিত হন। নির্বাচনটি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের

অধ্যাপক রায় বাহাদুর খগেন্দ্রনাথ মিত্রের কক্ষে মাননীয় উপাচার্যের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়েছিলো। নির্বাচকমণ্ডলীর মধ্যে ছিলেন কলা অনুষদের ডীন জনাব এস. এ. সলিম, ড. এস. কে. দে, রায় বাহাদুর খগেন্দ্রনাথ মিত্র, ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ এবং খান বাহাদুর আবদুর রহমান খান। প্রাজ্ঞ নির্বাচকমণ্ডলীর সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের সুপারিশে ড. মনোমোহন ঘোষ উক্ত পদে যথাসময়ে নবায়ন সাপেক্ষে দু' বছরের জন্য মনোনীত হন। ১২ই জুলাই, ১৯৪৪-এ প্রদত্ত নিয়োগপত্রে উল্লিখিত,-

> That Dr. Manomohan Ghosh be appointed Reader in Bengali on an initial salary of Rs. 400/-per mensem...for a period of two years in the first instance with effect from the date of his joining, the appoinment to be renewed on approved Service up to the end of the session in which he will attain the age of 55 years.

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতো বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব ড. মনোমোহন ঘোষের পাণ্ডিত্য ও গবেষক হিসেবে তাঁর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। ২রা মে, ১৯৩৪-এ প্রদত্ত রবীন্দ্রনাথের প্রশংসাপত্রে উল্লিখিত, "শ্রীযুক্ত মনোমোহন আমার সুপরিচিত। অনেকদিন শান্তিনিকেতন বিদ্যাভবনে তিনি গবেষণার কাজে নিযুক্ত ছিলেন। এই কাজে তিনি কৃতিত্ব লাভ করিয়াছেন। বাংলা ভাষা অধ্যয়ন ও অধ্যাপনায় তিনি পারদর্শী বলিয়া গণ্য। যে কোনো কলেজে তিনি বাংলা অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হইলে আপন যোগ্যতা প্রমাণ করিতে পারিবেন তাহাতে সংশয়মাত্র নাই।' মনোমোহন প্রসঙ্গে ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ১৯৪৪-এর ১৪ মার্চে লেখা তাঁর সুদীর্ঘ প্রশংসাপত্রে উল্লেখ করেছেন,

> Dr. Ghosh is an all-round man, and I think it will be difficult to find a scholar of his attainments for Bengali, equipped as he is with a through knowledge of Modern Bengali Literature and with Sanskrit, Prakrit, and Comparative Philoloogy. His studies in Avesta and old Persian as part of his Com: Phil: course has furnished him with a base for tackling the Persian element in Bengali.....His long contact with Rabindranath at Santiniketan has also its unique Value in his cultural and mental development.
>
> I think Dr. Ghosh will be an ornment in any learned

institution where he will be, and I have very high hopes of his future distinction as one of the best known scholars and educationists of Bengal and India.

০৪. ১ আগস্ট, ১৯৪৪-এ ড. মনোমোহন ঘোষ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে 'রীডার' এবং বিভাগীয় প্রধান হিসেবে যোগদান করেন। শ্রীভবতোষ দত্ত লিখেছেন, 'চর্যাপদ আমরা পড়েছিলাম ডক্টর মনোমোহন ঘোষের কাছে।...তিনি ছিলেন প্রাকৃত সাহিত্যে পণ্ডিত।'[৬] তাঁর প্রাক্তন ছাত্র ড. কাজী দীন মুহম্মদ জানিয়েছেন যে, ড. ঘোষ তাঁদের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পড়াতেন। সম্ভবতঃ প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের পাঠদানের দায়িত্ব তিনি গ্রহণ করেছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বল্পকালীন অবস্থান তাঁর জীবনে খুব একটা নিস্তরঙ্গ ছিলো না। ভবতোষ দত্ত পূর্বোক্ত স্মৃতিচারণায় আভাস দিয়েছেন, 'কী একটা গোলমাল চলছিল তাঁর কর্তৃপক্ষের সঙ্গে।' সম্ভবতঃ এটা ১৯৪৬-এর জনু / জুলাই-এর ঘটনা। অনমনীয়তা ও সিদ্ধান্তে অবিচলতা ছিলো মনোমোহন ঘোষের অন্যতম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। ফলে বারংবার প্রতিকূল পরিবেশের মুখোমুখি হয়েছেন এবং কখনো তাঁর অবস্থান থেকে সরে আসেননি। এ ধরনের দৃঢ়চেতা মানুষ বৈষয়িক ব্যাপারে যুগের হাওয়ার আনুকূল্য প্রত্যাশা করেন না। বঞ্চনা এঁদের ধর্তব্যের মধ্যেই আসে না এবং স্বভাবতই ক্রমশঃ এঁরা নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েন। ঢাকায় ড. ঘোষের স্বল্পকালীন চাকুরী জীবনে এ ঘটনার পুনরাবৃত্তি রীতিমতো দৃষ্টিগ্রাহ্য। মনোমোহন ঘোষকে শর্ত সাপেক্ষে দু' বছরের জন্যে অস্থায়ীভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োগ করা হয়েছিলো এবং তাঁর চাকুরির সময়সীমা ছিলো ৩১ জুলাই, ১৯৪৬ পর্যন্ত। বিভিন্ন সূত্রে প্রাপ্ত তথ্য থেকে স্পষ্টতই প্রতীয়মাণ হয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি প্রভাবশালী মহল তাঁর প্রতি সুপ্রসন্ন ছিলেন না। ফলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁকে স্থায়ীভাবে নিয়োগ কিংবা চাকুরিকাল বর্ধিতকরণের বিষয়টি অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। ২৪ জুলাই, ১৯৪৬-এ চাকুরিসংক্রান্ত বিষয় নিয়ে ড. ঘোষ উপাচার্য মহোদয়ের সঙ্গে যে আলোচনা করেন তারই আলোকে ২৬·৭·৪৬-এ উপাচার্য মহোদয় বিস্তারিতভাবে ড. ঘোষকে পরিস্থিতি অবহিত করেন। দীর্ঘ পত্রটিতে ড. ঘোষের প্রতি মাননীয় উপাচার্যের সহানুভূতি সুস্পষ্ট। ড. ঘোষের চাকুরি স্থায়ী কিংবা মেয়াদ বৃদ্ধির বিপক্ষে এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলে জোরালো অভিমত থাকার উল্লেখ করে উপাচার্য মহোদয় তাঁকে লিখেছিলেন,

I am writing this letter to confirm what I told you on the 24th. The Executive Council will decide probably on the 3rd of August whether to terminate your appointment and

readvertise the post or to continue your appointment, and if so, for what period...If you wish to wait for the decision of the University, then I am willing to extend your appointment from the 1st August until the decision of the University.

২৯ জুলাই, ১৯৪৬-এ ড. ঘোষ উপাচার্য মহোদয়ের পত্রোত্তরে দৃঢ়তার সঙ্গে লিখেছিলেন-'In spite of any adverse report which might have reached the Executive Council I strongly belive that I honestly, faithfully and diligently discharged the duties of my office in the University...' এবং অতঃপর তিনি এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের সিদ্ধান্তের জন্য অপেক্ষার কথা উল্লেখ করে এ-বিষয়ে উপাচার্য সাহেবের হস্তক্ষেপ কামনা করেন। ঐ তারিখেই উপাচার্য মহোদয় ড. ঘোষকে অবহিত করার জন্যে রেজিস্ট্রার সাহেবকে লেখেন, 'Dr. M. M. Ghosh, ...may be informed that I have extended his appointment temporarily from 1st August 1946 until the date when the question of his reappointment is finaly decided by the E. C.' এ-বিষয়ে এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলে ৩ আগস্ট, ১৯৪৬-এ অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত ৭৮৪৬ তারিখের রেজিস্ট্রার সাহেব ড. ঘোষকে অবহিত করেন, That the question of confirmation of the appointment of Dr. M. M. Ghosh be taken up in February, 1947 and that his appointment be extended till the end of February, 1947."

স্থায়ী না করে মাত্র ছ' মাসের জন্য চাকুরির মেয়াদ বৃদ্ধির এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত ড. মনোমোহন ঘোষ হৃষ্টচিত্তে গ্রহণ করতে পারেননি। মাস তিনেকের মধ্যেই তিনি আশংঙ্কা করেন পরবর্তী সময়ে কর্তৃপক্ষ হয়তো তাঁর চাকুরির মেয়াদ আর বৃদ্ধি করবেন না। ড. ঘোষের বিবেচনায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এ বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণে ইচ্ছাকৃতভাবে বিলম্ব করেছে। এমনকি তাঁর চাকুরি নবায়নের উদ্দেশ্যে যে কমিটি গঠন করা হয় তা-ও ছিলো বিশ্ববিদ্যালয় আইনের পরিপন্থী। ফলে ড. ঘোষ ১৯৪৬-এর ২০ ডিসেম্বরে তাঁর পদত্যাগপত্র পেশ করেন। কমিটি সম্পর্কে তাঁর প্রবল আপত্তির স্বপক্ষে উল্লিখিত, 'it included only one non-salaried member of the executive council, and such a constitution of the committee has very seriously effected the consideration of the question of the renewal of my

service.' পদত্যাগপত্রে তাঁর চাকুরি নবায়নে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের অনভিপ্রেত বিলম্বের উল্লেখ করে ড. ঘোষ লেখেন, 'This undue delay and the unexpected procedure in the matter of handling the question of the renewal of my service has very greatly injured me mentally as well as materially.' পদত্যাগপত্রটি গ্রহণ প্রসঙ্গে উপাচার্য মহোদয় ২০·১২·৪৬· তারিখে রেজিস্ট্রার সাহেবকে লিখিত পত্রে উল্লেখ করেন যে, ৩ আগস্ট, ১৯৪৬–এ অনুষ্ঠিত এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের সভায় ড. ঘোষের চাকুরি স্থায়ীকরণের বিষয়ে ১৯৪৭–এর ফেব্রুয়ারীতে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে বলে গৃহীত প্রস্তাবটি তাঁকে যথাসময়ে অবহিত করা হয়েছিলো। অতঃপর তাঁর সংযোজন,— 'I tried to convince him (ড. ঘোষকে) that there was no personal animus against him and that the matter was taken up only in the usual official way. He (ড. ঘোষ) said that he was not prepared to discuss all these questions and wanted his letter of resignation to take effect. I have, therefore, with regret accepted his resignation.

১৯৪৭–এর ১৫ জানুয়ারী পর্যন্ত ড. মনোমোহন ঘোষ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের 'রীডার' ও বিভাগীয় প্রধান হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তারপর কলকাতা প্রত্যাবর্তন করেন।

ঢাকা থাকাকালীন আরো একটি ঘটনা থেকে ড. ঘোষের আপোসহীন অনমনীয় ঋজু চরিত্রের পরিচয় মেলে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রধান হিসেবে তিনি ঢাকা ইন্টারমিডিয়েড ও সেকেন্ডারি এডুকেশন বোর্ডের সঙ্গে শিক্ষা–সংক্রান্ত নানা বিষয়ে জড়িত ছিলেন। কোন কোন বিষয়ে তাঁর মতামত বোর্ড কর্তৃক গৃহীত না হওয়ায় তিনি অপমানিত বোধ করেন এবং বোর্ডের কর্মকাণ্ড থেকে নিজেকে বিযুক্ত করার সিদ্ধান্ত ২ নভেম্বর, ১৯৪৬ তারিখে উক্ত সংস্থার সচিবকে জানিয়ে দেন। সম্ভবতঃ বিষয়টি বোর্ডের পক্ষ থেকে উপাচার্য মহোদয়কে অবহিত করে এ' বিষয়ে তাঁর হস্তক্ষেপ কামনা করা হয়। ড. ঘোষও ঢাকা বোর্ডের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কচ্ছেদের কারণসমূহ লিখিতভাবে উপাচার্য সাহেবের গোচরীভূত করেন। সবকিছু বিচার–বিবেচনা করে উপাচার্য মহোদয় তাঁকে বৃহত্তর স্বার্থে বোর্ডের ক্রিয়াকর্মে সংশ্লিষ্ট থাকবার জন্যে ব্যর্থ অনুরোধ করেন। এ' বিষয়ে ১৮ নভেম্বর, ১৯৪৬ তারিখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার সাহেবকে লেখা একটি পত্রে উপাচার্য মহোদয় বোর্ডের বিরুদ্ধে ড. ঘোষের

উত্থাপিত অভিযোগসমূহ উল্লেখ করে লেখেন,—

> Dr. Ghosh had said in one of his reports on one occasion that the standard of Bengali in the intermediate Board of Dacca was very much lower than that in Calcutta; so I told him that in view of this opinion it was all the more necessary for him to take every possible step to improve the standard of Bengali in the Board and in the University, and he should not therefore dissociate himself from the work of the Board. He told me that the committee of courses of studies in Bengali was a "packed" one and that there were members who were not competent to be members and that they recommended examimers who were incompetent and inefficient as examiners and therefor he did not wish to associate himself with this committe. He also said that the committee had not accepted his opinion in certain matters and the examination committe of the Board had also not accepted his recommendation as Head Examiner, and therefore he felt insulted.
>
> ...I tried to explain to Dr. Ghosh that this was not a personal reflecction against him by only means and that he would be letting down the University and doing harm to the teaching of Bengali in the Board and the University if he were to dissociate himself in this manner from the Board. He told me that he was unable to reconsider his decision and he asked me to excuse him.

সংসদ বাঙালী চরিতাভিধান-এ উল্লিখিত— 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ও পরে প্রেসিডেন্সী কলেজের বাংলা বিভাগের প্রধান হিসাবে কাজ করে ১৯৫৪ খ্রী: [ড. মনোমোহন ঘোষ] অবসর নেন। ভারত সরকার ১৯৫৭ খ্রীঃ তাঁকে বর্তমান কম্পুচিয়ার নম্-পেন বৌদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত পড়ানর জন্য প্রেরণ করেন। সেখানে তিনি ৬ বছর ছিলেন।'[৭] ড. ভবতোষ দত্তের লেখা থেকে জানা যাচ্ছে যে, ড. ঘোষ কলকাতার চারুচন্দ্র কলেজেও কিছুদিন অধ্যাপনা করেছেন। প্রচারবিমুখ এই পণ্ডিত আজীবন বিদ্যাচর্চা করে গেছেন। এ' প্রসঙ্গে ড. দত্ত লিখেছেন, –'ডক্টর ঘোষ এখনও লেখাপড়া নিয়ে লোকচক্ষুর আড়ালেই থাকেন।

বাসে একদিন আমাকে দেখে বিশেষভাবে বাড়িতে যেতে বললেন। গিয়েছিলাম, বড় খুশি হয়ে তিনি তাঁর নব প্রকাশিত নাট্যশাস্ত্রের ভূমিকার রিপ্রিন্ট দিলেন। শুনে বিস্মিত হলাম বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্মতত্ত্বের ইংরেজী অনুবাদ তিনি সম্পূর্ণ করে রেখেছেন। একেবারে নিরাসক্ত কাজ।'[৮]

ড. মনোমোহন ঘোষের সহধর্মিনী শ্রীযুক্তা মমতা ঘোষ কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের ভাগিনেয়ী এবং কবি হিসেবেও তাঁর পরিচিত ছিলো।

০৫. বাংলা ও ইংরেজীতে ড. মনোমোহন ঘোষ গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি গ্রন্থ রচনা ও অনুবাদ করেছেন। তাঁর সম্পাদিত গ্রন্থগুলোও গবেষণাধর্মী এবং মূল্যবান।

ড. ঘোষ বিরচিত গ্রন্থাবলী :

১. *অভিনয়-দর্পণ* (সংস্কৃত ও ইংরেজী), কলকাতা, ১৯৩৪
২. *Medieval Mysticism of India* (বাংলা গ্রন্থের অনুবাদ), লন্ডন, ১৯৩৫
৩. *চতুরঙ্গ-দীপিকা* (সংস্কৃত ও ইংরেজী), কলকাতা, ১৯৩৬
৪. *পানিনীয় -শিক্ষা* (সংস্কৃত ও ইংরেজী), কলকাতা, ১৯৩৮
৫. *কর্পূরমঞ্জরী* (প্রাকৃত ও ইংরেজী), কলকাতা, ১৯৩৯
৬. *রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র* (সম্পাদনা), কলকাতা, ১৯৪২
৭. *বাংলা গদ্যের চার যুগ* **অথবা বাংলা সাহিত্যে গদ্যরীতির উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের বিবরণ,** কলকাতা,১৯৪২
৮. *প্রাচীন ভারতের নাট্যকলা* , কলকাতা, ১৯৪৫
৯. *সাহিত্য-শিল্প* , কলকাতা, ১৯৪৫
১০. *বাংলা সাহিত্য* ,কলকাতা,১৯৫৫
১১. *Bharat's Natya'sastra* (with English translation, notes and introduction), কলকাতা, ১৯৫১
১২. *Ramds'arman's Prakrtakalpataru* (edited, translation and notes), কলকাতা, ১৯৫৫

উল্লিখিত গ্রন্থাবলী ব্যতীত ড. ঘোষের ইংরেজী ও বাংলায় রচিত বহু মূল্যবান প্রবন্ধ *Indian Historical Quarterly* , *Journal of the Dept. of Letters*

(কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়), *The Annals of the Bhandarkar Oriental Research Institute , Journal of the Greater India Society , বিচিত্রা , প্রবাসী* প্রভৃতি গবেষণাপত্র ও সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে।

বাংলা গদ্যরীতির ইতিহাস সংক্রান্ত পুস্তকের অভাব দেখে ড. মনোমোহন ঘোষ *বাংলা গদ্যের চার যুগ* (১৯৪২) গ্রন্থটি প্রণয়নে আগ্রহী হয়েছিলেন। তখনো উচ্চতর রচনার মাধ্যম হিসেবে চলিত বাংলার প্রচলন অবাধ না হলেও ড. ঘোষ তাঁর গ্রন্থে কথ্যরীতি ব্যবহারের কৈফিয়ৎ হিসেবে প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় লিখেছেন,—'গুরুগম্ভীর বিষয়ের আলোচনায় চলতি ভাষার ব্যবহার এখনো অনেক পাঠকের আন্তরিক অনুমোদন লাভ করতে পারে নি। তাঁদের প্রতি এই নিবেদন যে, বাংলা গদ্যের ক্রমবিকাশ সহজবোধ্য হবে মনে করেই এতে চলতি ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে।' (পৃ. ১) সম্ভবতঃ ভাষার ক্ষেত্রে স্বামী বিবেকানন্দই (১৮৬৩–১৯০৩) তাঁর আদর্শ। স্বামীজীর গদ্যে তিনি লক্ষ্য করেছেন 'এক বিশেষ শক্তি ও সৌন্দর্য।' তাঁর সুদৃঢ় প্রত্যয়, 'বাঙালী ধীরে ধীরে হলেও সাহিত্যের ভাষা সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দের মতকে বহুলাংশে গ্রহণ করবে।' অতঃপর তিনি স্বামীজীর ভাষার রীতি সংক্রান্ত বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন,–

> আমাদের দেশে প্রাচীনকাল থেকে সংস্কৃতয় সমস্ত বিদ্যা থাকার দরুন, বিদ্বান এবং সাধারণের মধ্যে একটা অপার সমুদ্র দাঁড়িয়ে গেছে।... স্বাভাবিক যে ভাষায় মনের কথা আমরা প্রকাশ করি, যে ভাষায় ক্রোধ, দুঃখ, ভালবাসা ইত্যাদি জানাই— তার চেয়ে উপযুক্ত ভাষা হতেই পারে না; সেই ভাব, সেই ভঙ্গী, সেই সমস্ত ব্যবহার করে যেতে হবে। ও ভাষার যেমন জোর, যেমন অল্পের মধ্যে অনেক, যেমন যেদিকে ফেরাও সেদিকে ফেরে, তেমন কোন তৈরী ভাষা কোনও কালেও হবে না।[৯]

অবশ্য গদ্যরীতির ব্যাপারে কোন রকম গোঁড়ামী তাঁর ছিলো না এবং ১৯৫৫–তে প্রকাশিত *বাংলা সাহিত্য* গ্রন্থে তিনি প্রচলিত সাধু রূপই ব্যবহার করেছেন। সমালোচনার ক্ষেত্রেও ড. ঘোষ মুক্তবুদ্ধি ও সুরুচির পরিচয় দিয়েছেন এবং প্রাপ্য মর্যাদা থেকে কাউকে বঞ্চিত করেননি।

'উপক্রমণিকা' অংশে ব্যক্তিগত পত্র ও অন্যান্য সূত্রে প্রাপ্ত বাংলা গদ্যের নমুনা বিচার–বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এ ছাড়া বাংলা গদ্যকে বিভিন্ন যুগে বিন্যস্ত করে কালানুক্রমিক আলোচনা করেছেন। বঙ্কিমযুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখক হিসেবে মীর মশাররফ হোসেন মনোমোহন ঘোষের সশ্রদ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। লিখেছেন,—'তাঁর (মশাররফ হোসেনের) লেখার গুণে সুদূর আরব ভূমির একটি সুপ্রাচীন কাহিনী (কারবালার কাহিনী) হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে বাঙালী পাঠকের নিকট একান্ত হৃদয়গ্রাহী হয়ে উঠেছে। ...তাঁর এ গ্রন্থ (বিষাদ

সিন্ধু) যে বহুকাল যাবৎ বাঙালী পাঠকদের প্রিয় হয়ে থাকবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।'[১০]

চলিত গদ্যরীতি যে অনতিবিলম্বে জনপ্রিয় হয়ে সাধু ভাষার স্থলাভিষিক্ত হবে সে বিষয়ে ড. ঘোষ ছিলেন সুনিশ্চিত।

অধ্যাপনা করতে গিয়ে শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনের দিকে দৃষ্টি রেখে ড. মনোমোহন ঘোষ দুটো গ্রন্থ রচনা করেন– *সাহিত্য–শিল্প* (১৯৪৫) এবং *বাংলা সাহিত্য* (১৯৫৫)। প্রথম গ্রন্থটিতে সাহিত্যের রূপ, বিষয় ও সাহিত্যবোধ, কাব্যের বিবিধ অঙ্গ ও শৈলী এবং কথাসাহিত্যের নানা প্রকরণ নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা রয়েছে। ভূমিকাতেই লেখক স্বীকার করেছেন যে, প্রাথমিক জ্ঞান দানের জন্যে রচিত বলে গ্রন্থটিতে 'কোনো উচ্চাঙ্গের সাহিত্য–তত্ত্ব বা সাহিত্য আলোচনার প্রসঙ্গ আনা হয়নি।'

কবিতার আলোচনা প্রসঙ্গে কাজী নজরুল ইসলামের ভাষা, ছন্দ ও কল্পনা–নৈপুণ্যের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে তাঁকে সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে তুলনা এবং তাঁর কাব্যে সত্যেন দত্তের প্রভাব নির্দেশ করে ড. ঘোষ লিখেছেন,–'তবু হৃদয়াবেগের তীব্রতায় তিনি (নজরুল) সত্যেন্দ্রনাথকে ছাড়িয়েছেন। তাঁর কবিতাগুলিই এ কথার প্রমাণ।'[১১]

রবীন্দ্রানুসারী কবি সমাজ তাঁদের সাধনায় ছিলেন সনিষ্ঠ। যাঁরা রবীন্দ্রবলয় থেকে বেরিয়ে আসতে প্রয়াসী ছিলেন তাঁরাও কি রবীন্দ্রালোকে স্নাত হননি? অত্যাধুনিক কবিরা কবিতাকে যে 'সংঘাতবহুল জীবনের প্রতীক হিসেবে দেখতে চেয়েছিলেন রবীন্দ্রকাব্যে তারও সার্থক পদচারণা নির্লক্ষ্য নয়। যদিও স্বকালে আধুনিক কবিদের (বুদ্ধদেব বসু, অমিয় চক্রবর্তী প্রমুখ) কবিকৃতি সাধারণ পাঠককে তেমন আকর্ষণ করতে পারেনি, তবু মনোমোহন ঘোষ নতুনকে সানন্দে বরণ করার পক্ষেই অভিমত পোষণ করতেন। কিছুটা দ্বিধান্বিত চিত্তে তিনি লিখেছেন, 'নূতন যুগকে নূতনরূপে প্রকাশ করার এই চেষ্টা যে কালক্রমে বাংলা গীতি কবিতায় যথার্থ জনপ্রিয় সৌন্দর্য ও রস আনতে সমর্থ হবে না, তা জোর করে বলা যায় না। মাইকেলের অমিত্রাক্ষর প্রচলনের চেষ্টাও একদিন বিরুদ্ধতার উদ্রেক ক'রেছিল।'[১২] বলা বাহুল্য রবীন্দ্রনাথের গদ্য কবিতাও তৎকালীন এক শ্রেণীর কাব্যানুরাগীর সহৃদয় সহানুভূতি লাভে সমর্থ হয়নি এবং সমস্ত দ্বিধাসংশয়ের অবসান ঘটিয়ে আধুনিক কবিতার অগ্রযাত্রা বর্তমানে অপ্রতিরোধ্য।

বাংলা সাহিত্য গ্রন্থে বঙ্গ সংস্কৃতির গোড়ার কথা, অনার্য প্রভাব, রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক পরিবেশ ইত্যাদি বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। বাংলা সাহিত্যের

ইতিহাসকে ড. ঘোষ চারটি প্রধান যুগে বিন্যস্ত করেছেন এবং প্রতিটি যুগ আবার একাধিক উপ-যুগে বিভক্ত।

মধ্যযুগে বাংলা সাহিত্যের বিকাশ ও সমৃদ্ধির ক্ষেত্রে মুসলমান নৃপতিদের পৃষ্ঠপোষকতা এবং মুসলিম কবিদের অবিস্মরণীয় অবদানের মূল্যায়নে মনোমোহন ছিলেন নিষ্কুণ্ঠ। রাজনৈতিক ও সামাজিক অস্থিরতার জন্য তাঁর বিবেচনায় 'তুর্কী- বিজয়ের যুগ' (১২০০-১৩৫৯) সৃষ্টিশীল প্রতিভা বিকাশের অনুকূল ছিলো না। ফলে এ যুগটিকে তিনি 'তমসাচ্ছন্ন যুগ' হিসেবেই গ্রহণ করেছেন। অবশ্য বর্তমানে বাংলা সাহিত্যের ঐতিহাসিক ও বিদ্বজ্জন তথাকথিত 'আঁধার যুগ' তত্ত্বের অন্তঃসারশূন্যতা প্রমাণ করেছেন। তাঁদের সুযৌক্তিক পর্যবেক্ষণ-'বাঙলা বারো, তেরো ও চৌদ্দ শতকের মধ্যভাগ অবধি লেখ্যভাষার স্তরে উন্নীত হয়নি। এটি হচ্ছে বাঙলার স্বাকার প্রাপ্তির কাল ও মৌখিক রচনার যুগ।'[১৩] বখতিয়ার খিলজী ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের উপাসনালয় ধ্বংস করে তারই মাল-মশলা দিয়ে মসজিদ নির্মাণ এবং 'বিধর্মীদের' ছলে বলে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করেছিলেন-এ' বক্তব্যের পরেও মনোমোহনের অভিমত,-'কিন্তু এ সকল সত্ত্বেও বখতিয়ারকে রক্তপিপাসু নরপতি বলা যায় না।'[১৪] 'আদি মধ্যযুগে' (১৩৫৯-১৪৯৩)-এর অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতিভা মালাধর বসুর (আ. ১৪৫০-১৫২০) *শ্রীকৃষ্ণবিজয়* কাব্যের উৎকর্ষের জন্যে গৌড়ের সুলতান তাঁকে গৌরবসূচক 'গুণরাজ খান' উপাধিতে সম্মানিত করেন। এই 'গৌড়েশ্বর'কে মনোমোহন 'শামসুউদ্দীন ইয়ুসুফ শাহ্' বলে সনাক্ত করে লিখেছেন,-'একজন মুসলিম সুলতানের পক্ষে হিন্দুর ধর্ম-গ্রন্থ অবলম্বনে রচিত কাব্যের জন্য হিন্দু কবিকে পুরস্কৃত করা সেকালের সাম্প্রদায়িক উদারতার এক প্রকৃষ্ট নিদর্শন।'[১৫] নানা ঐতিহাসিক তথ্য বিশ্লেষণ করে অধ্যাপক সুখময় মুখোপাধ্যায় সিদ্ধান্ত করেছেন যে, মালাধর বসুর পৃষ্ঠপোষক 'গৌড়েশ্বর' হচ্ছেন শামসুউদ্দীন য়ুসুফ শাহের পিতা এবং বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ সুলতান রুকনুদ্দীন বারবক শাহ্ (রাজত্বকাল : ১৪৫৫-১৪৭৬)।'[১৬] এ বিষয়ে অধ্যাপক আহমদ শরীফও অভিন্ন মত পোষণ করেন। অবশ্য মালাধর বর্ণিত 'গৌড়েশ্বর' যিনিই হোন না কেন, তাঁর সম্পর্কে মনোমোহনের মূল্যায়ন যথার্থ। 'অন্ত্য-মধ্যযুগ' (১৪৯৩-১৭০৭)-এর অন্তর্ভুক্ত হুসেনশাহী শাসনকাল বাংলার ইতিহাসে সর্বদিক থেকেই 'সুবর্ণযুগ' হিসেবে চিহ্নিত। সুলতান হুসেন শাহের (রাজত্বকাল : ১৪৯২-১৫১৯) আমলে বাঙালী মনীষার বহুমুখী বিকাশ ঐতিহাসিকদের বিস্ময়-বিমুগ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। বহু ইতিহাসবেত্তা হুসেন শাহ্কে মধ্যযুগের বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ 'সুলতান' হিসেবে

আখ্যায়িত করেছেন। বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে হুসেন শাহ্ এবং তাঁর উত্তরপুরুষদের বিপুল অবদান ও তাঁদের উদার দৃষ্টিভঙ্গির জন্যে তাঁরা ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে বাঙালীর অফুরন্ত শ্রদ্ধা-ভালবাসায় সিক্ত হয়েছিলেন। হুসেনশাহী শাসনামলের মূল্যায়নে মনোমোহনও নিঃশঙ্কচিত্ত, —

> হুসেন শাহ্ যে বিদেশীর সন্তান ও ভিন্ন ধর্মাবলম্বী, হিন্দু প্রজারা তাহা ভুলিয়া গেলেন, এবং কেহ কেহ তাঁহাকে কৃষ্ণের অবতারের সঙ্গে তুলনা করিলেন।...ভিন্ন ধর্মাবলম্বী হইলেও হিন্দু প্রজাগণের প্রতি তাঁহার অনুগ্রহের সীমা ছিল না।...যে সকল উচ্চ পদে কেবল একান্ত বিশ্বাসভাজন ব্যক্তিরাই নিয়োগযোগ্য, হুসেন শাহ্ তাহাতেও হিন্দুগণকে নিযুক্ত করিতে দ্বিধা করেন নাই।...হিন্দু প্রজাদিগের প্রতি হুসেন শাহের সানুগ্রহ দৃষ্টির ফলে দেশীয় সংস্কৃতি নানা দিক দিয়া লাভবান হইয়াছিল। এই লাভের একটি বিশিষ্ট প্রমাণ বাংলা সাহিত্যেরঅগ্রগতি।...
>
> ...একজন নিষ্ঠাবান মুসলমান হইয়াও হুসেন শাহের পরধর্মবিদ্বেষ মোটেই ছিল না।...হুসেন শাহের পুত্র নুসরৎ শাহ্ও পিতার অনুসৃত পথে চলিয়াছিলেন এবং নুসরতের পুত্র আলাউদ্দীন ফিরোজ শাহ্ সম্বন্ধেও সেই কথা বলা যায়।[১৭]

'বঙ্গের প্রত্যন্ত-ভূমিতে বাংলা সাহিত্য' চর্চা প্রসঙ্গে ড. মনোমোহন ঘোষ সুস্পষ্ট অভিমত পোষণ করেন যে, ষোড়শ শতাব্দীতে কামরূপ অঞ্চলে রচিত সাহিত্য বর্তমানে 'অসমীয়া সাহিত্য' রূপে পরিচিত হলেও সেগুলো বাংলা ভাষায় রচিত এবং বাংলা সাহিত্যেরই অন্তর্ভুক্ত। কারণ অসমীয়া ভাষার পৃথক সত্তা কিংবা ব্যাকরণগত বৈশিষ্ট্য সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্বে রূপ পরিগ্রহ করেনি। সর্বোপরি তিনি লিখেছেন,-'ষোড়শ শতাব্দীর কামরূপ-অঞ্চলের সাহিত্যের ভাষা আর উত্তর-পূর্ববঙ্গের কথ্য ভাষায় কোনও ভেদ নাই।'[১৮]

সপ্তদশ শতাব্দীতে আরাকান তথা রোসাঙ রাজসভার পৃষ্টপোষণায় বাংলা সাহিত্যের নবদিগন্ত উন্মোচিত হয়। এই রাজসভার আনুকূল্যপ্রাপ্ত কবিদের সকলেই মুসলমান। এঁদের মধ্যে *সতীময়না* বা *লোরচন্দ্রানী* কাব্যগ্রন্থের রচয়িতা দৌলৎকাজী সর্ব প্রাচীন এবং তাঁর অনুবাদমূলক কাব্যগ্রন্থটিকে ড. ঘোষ 'বাংলা সাহিত্যের সাক্ষাৎরূপে ধর্মভাবহীন (Secular) প্রথম রচনা' হিসেবে অভিহিত করেছেন। অসাধারণ পাণ্ডিত্য, সৃজনীশক্তি এবং উদার দৃষ্টিভঙ্গীর জন্য কবি আলাওল ও সৈয়দ সুলতানকে লেখক সশ্রদ্ধ প্রণতি জানিয়েছেন। রচনাবলীর সীমাবদ্ধ প্রচারের জন্যে কিছুটা ভারাক্রান্ত চিত্তে লিখেছেন,-'তাঁহার (আলাওলের) গ্রন্থগুলি পড়িলে মনে হয় না যে উহারা গ্রন্থান্তরের অনুবাদ। এদিক দিয়া উহারা বাঙ্গলা রামায়ণ মহাভারত আদির সমশ্রেণীস্থ। বড়ই দুঃখের বিষয় এই যে, ধর্ম বিষয়ক বিশেষত হিন্দু ধর্মসম্পর্কিত রচনা নহে বলিয়া এই গ্রন্থগুলির পঠন-

পাঠন প্রায়শ সম্প্রদায় বিশেষের মধ্যে আবদ্ধ ছিল, এই কারণে ইহারা তেমন খ্যাতিলাভ করিতে পারে নাই।'[১৯] সৈয়দ সুলতান ও তাঁর কাব্য *নবীবংশ* (১৬৫৪–৫৫) প্রসঙ্গে ও ড. ঘোষের অনুধাবন স্মরণযোগ্য,–'ইহাতে (নবীবংশ) সেমিটিক সৃষ্টিতত্ত্ব ও নবীগণের কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। কবির উদার দৃষ্টিতে বিষ্ণু, শিব, কৃষ্ণ–আদিও নবীরূপে দেখা দিয়াছেন।'[২০]

কবি কায়কোবাদের কাব্যসৃষ্টির কাল রবীন্দ্রযুগের অন্তর্ভুক্ত হলেও কাব্যভাবনা ও শৈলীর জন্যে তাঁকে প্রাক্–রবীন্দ্রযুগের কবি হিসেবে চিহ্নিত করে মনোমোহন সুবিবেচনার পরিচয় দিয়েছেন। চর্যাপদকর্তা থেকে জীবনানন্দ দাশ, সুকান্ত ভট্টাচার্য পর্যন্ত উল্লেখ্য প্রায় সকল কবি–সাহিত্যিকের প্রতিই লেখক সুবিচার করার প্রয়াস পেয়েছেন। তবু একটি মাত্র গ্রন্থে সমগ্র বাংলা সাহিত্যের বিশাল পরিসরকে ধারণ করা সম্ভব নয়—বাস্তবসম্মতও নয়। ফলে বাংলা সাহিত্যের আলোচনায় অন্তর্ভুক্তির দাবী রাখে এমন কিছু নাম দৃষ্টির অন্তরালে থেকেগেছে।

০৬. অধ্যয়ন ও অধ্যাপনাই ছিলো ড. মনোমোহন ঘোষের ব্রত এবং অভীষ্টলক্ষে তিনি ছিলেন নিবিষ্টচিত্ত। কৈশোর–যৌবনের সন্ধিলগ্নে যুগদাবীকে তিনি সানন্দে স্বীকার করেছিলেন— ফলে কারাবাস, পরিণতিতে দোকান ও গুদাম রক্ষকের চাকুরিসূত্রে শান্তিনিকেতনের সঙ্গে পরিচয় এবং রবীন্দ্রসান্নিধ্য এসে কর্মজীবনের যথার্থ স্রোতের সন্ধান লাভ। অতঃপর তাঁকে আর ডানে–বামে দৃষ্টি ফেরাতে হয়নি। একটি মাত্র পথই তাঁর জন্যে নির্দিষ্ট— জ্ঞানার্জন ও বিতরণ। পথটি সর্বদা কুসুমাস্তীর্ণ না হলেও তাঁর অবিচল চারিত্র্য তাকে অতিক্রম করে গেছে দৃঢ় পদবিক্ষেপে। বৈষয়িক প্রলোভনে নতশীর্ষ হননি, জ্ঞানস্পৃহাও হয়নি অবদমিত। দীপ্র অহংবোধ এই নিভৃতচারী শিক্ষাব্রতীকে দিয়েছে সাগ্নিক–কল্প মর্যাদা। *

তথ্যনির্দেশ

১. শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার, *ঢাকার স্মৃতি, আমাদের সেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়* (১৯৭৪) পৃ. ২৮
২. আমাদের সেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, পৃ. ১৪৫
৩. ঐ, অবিস্মরণীয়, পৃ. ১০৬–০৭
৪. ঐ, পৃ. ১০৭

৫. সংযোজন খণ্ড (১৯৮১), পৃ. ৮৩-৮৪

৬. আমার জীবনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, সুবর্ণলেখা (১৯৭৪), পৃ. ১৯৪

৭. সংযোজন খণ্ড (১৯৮১), পৃ . ৮৩-৮৪

৮. আমার জীবনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, *আমাদের সেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়,* পৃ. ১৯৪

৯. *বাংলা গদ্যের চারযুগ* (১৯৪২), পৃ. ২৫৩

১০. ঐ, পৃ.২০৮-১০

১১. গীতি-কবিতা (২), *সাহিত্য-শিল্প* (১৯৪৫), পৃ. ৬০

১২. ঐ, পৃ. ৬১

১৩. আহমদ শরীফ : *বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য* , ১ম খণ্ড (১৯৭৮), পৃ. ১১৮৩, এ গ্রন্থের ১৬৬ থেকে ১৮৩ পৃ. পর্যন্ত উল্লিখিত বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

১৪. *বাংলা সাহিত্য* (১৯৫৫), পৃ. ৩৬

১৫. ঐ, পৃ. ৬৪

১৬. *বাংলার ইতিহাসের দু'শো বছর : স্বাধীন সুলতানদের আমল,* ৩য় সংস্করণ, পৃ. ২৪

১৭. *বাংলাসাহিত্য,* পৃ. ৭৯

১৮. ঐ, পৃ. ১৭৭

১৯. ঐ, পৃ. ১৮৪

২০. ঐ, পৃ. ১৮৫

*ডঃ মনোমোহন ঘোষ সম্পর্কিত তথ্যাদি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংরক্ষিত তাঁর ব্যক্তিগত নথিপত্র থেকে সংগৃহীত।